Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501095 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

Shantiniketan's First Girl's Hostel Sree-Sadana: Tagore's Initiative to Cultivate Gender Equality

শান্তিনিকেতনে মেয়েদের প্রথম হস্টেল শ্রীসদন: লিঙ্গসাম্যে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগ

Dr. Madhuparna Karmakar
Independent Researcher
Bolpur, Santiniketan

Received on: 14th May 2026
Accepted on: 01st June 2026

Abstract:

Rabindranath's concern and special focus on women's education significantly contributed to the historical change in social dynamics. At the early age of Visva-Bharati Gurudev wanted women's 'Kalyanmayi' essence to nurture ashrama. 'Naribhavana' (1921) was the first initiative that fostered women's sense of belonging beyond social stratifications and gender norms of society. Sree-sadana, the first women's hostel, the seedbed of sisterhood, that we can say a direct reflection of Tagore's philosophy of humanity. There are many memoirs written on women's experience of hostel life, where we see how hostels reshaped women to achieve the practice of togetherness and 'Sokhitya' (sisterhood), how women experienced the journey from the narrow 'I' to great human sensibility.

My M.Phil. study describes women hosteler student's (VB and JU) lived experience and complexities of hostel life. My doctoral research focuses on the higher educational experience of women hostelers (VB and JU) belong to unprivileged socio-economic background. This paper aims to describe the history of women's hostels of Shantiniketan that is closely related to social reform and freedom of women from socio- cultural cage. How women in hostels at the early age of women's education rediscovered their 'reinvented self' beyond family roles/rules and regulations. This paper argues how hostels fostered sisterhood among women as a reflection of Rabindranath's educational philosophy's foundation to cultivate humanity. How 'Didi', 'Soi', 'Vogini' have become primary care givers and guides when women came to university to pursue their education away from home. Memoirs written by hosteler women based on Shantiniketan hostels reflect their understanding of humanity and sisterhood beyond family or blood relations. Gurudev's philosophy not only reshaped women's education but also generated a sense of collectivity. Focusing on the history of Shantiniketan's first women's hostel Sree-Sadana, this paper aims to understand Tagore's initiative to cultivate gender equality at Ashrama.

© Santiniketan Sahityapath

Key Words:
Sree-Sadana, Girl's Hostel, Rabindranath's Educational Philosophy, Women's Education, Freedom, Sisterhood

মূল প্রবন্ধ

তপোবনের ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে বিশ্বভারতীকে আবাসিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিকল্পনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সমসময়ে নারী শিক্ষার বিষয়টি মুখ্য না হলেও পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের শিক্ষার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে দেখেছেন। প্রথমযুগে শান্তিনিকেতনের বিশিষ্টজনেদের কন্যাদের নিয়ে নারীশিক্ষার প্রচলন এবং তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজে সহশিক্ষার গোড়াপত্তন খুব সহজ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ নারীদের 'শ্রী' ও 'কল্যাণ' স্পর্শে আশ্রমের উজ্জীবন চেয়েছিলেন। নারীশিক্ষার হাত ধরে ছাত্রীনিবাস গড়ে উঠল বিবিধ বাধাবিপত্তি পেরিয়ে। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সমসময় থেকেই নারীরা শান্তিনিকেতনের কর্মকাণ্ডে সামিল হয়েছেন। 'স্ত্রীশিক্ষা', 'শ্রীভবন সম্বন্ধে আমার আদর্শ' প্রবন্ধে তাঁর নারীশিক্ষা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা ও দর্শন প্রকাশিত হয়েছে তেমনি তৎকালীন শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন বিশিষ্টজনেদের লেখা চিঠিতে এই বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত চক্রবর্তী, হেমলতা সেন প্রমুখকে লেখা চিঠি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। একদিকে সামাজিক রক্ষণশীলতা, পশ্চাৎপদতার গ্রন্থিগু রবীন্দ্রনাথ একে একে খুলছেন, অন্যদিকে ব্যক্তিকে তার ক্ষুদ্রসীমা থেকে মুক্তি দিয়ে বৃহত্তর জীবনের সন্ধান দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ নারীদের শিক্ষা ও সমানাধিকারের কথা ভেবেছেন এবং তাদের সামিল করেছেন আশ্রমের কাজে শিক্ষায়, লিঙ্গবৈষম্যের সমস্ত রুদ্ধদ্বার তিনি মেয়েদের জন্য খুলে দেবার প্রয়াস করেছেন, রবীন্দ্রশিক্ষা দর্শনের মূলসুর 'মানবিকতার চর্চা' তার ভিতর প্রতিফলিত। নিতান্ত গৃহপালিত জীবন এবং কিছু দায়িত্ব ও ভূমিকায় আবদ্ধ নারীদের দিলেন মানুষ হয়ে ওঠার সমানাধিকার, মেয়েরা সামিল হলো সব কাজে। নারীদের জন্য এই মানবিক চর্চার দ্বার খুলে দেওয়া শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদান গুলির মধ্যে অন্যতম।

যে নারীরা এলেন আশ্রমিক হয়ে, যুক্ত হলেন এই আবাসজীবনে, আশ্রমে সার্বিক 'শুদ্ধতা' অনুশীলনের পাশাপাশি তাঁদের নিজেদের মধ্যে গড়ে উঠল মানবিকতার এক আশ্চর্য চর্চা, ভগ্নিত্বের বোধ। যারা আবাসে থাকলেন তারা নানা জায়গার, নানা ধর্মের, নানা বর্ণের, নানা আর্থ সামাজিক অবস্থানের, নানা মনস্তত্ত্বের ছাত্রী। কিন্তু তাঁরা যখন একত্রে বাস করতে শুরু করলেন হয়ে উঠলেন পরস্পরের 'ভগিনী'। দিদি অথবা বোন। তাঁরা পরিবারের আত্মীয়তার বাইরে গড়লেন মানবিক সম্বন্ধ। 'মানবিকতা'র চর্চা শুধু মাত্র পুরুষের পৃথিবীর চর্চা হয়ে থাকল না। সেখানে মেয়েরা অংশ নিল, 'অর্ধেক আকাশ' যুক্ত হলো। বৈশ্বিক মানবতাবাদে নারীদের এই সক্রিয় ভাবে সামিল করার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন একটি সার্থকতায় উন্নীত। প্রাথমিক ভাবে মেয়েরা রক্ষণশীল সামাজিক, পারিবারিক বন্ধন কেটে সামিল হয়েছেন আশ্রমে, সঙ্গে রক্ত সম্পর্ক, বৈবাহিক সম্পর্কের বাইরে তারা আপন করে নিয়েছেন সবাইকে। 'আপন হতে বাহির হয়ে' তাঁরা বাইরে এসে দাঁড়ালেন, বিশ্বলোকের সাড়া পেলেন বহুর মধ্যে। এই রূপান্তর তাদের ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তি দিল, তারা নিজেদের দেখল নতুন ভূমিকায়। পারিবারিক, সামাজিক ভূমিকার বদলে তারা সহপাঠীদের সঙ্গে ভিন্ন সমীকরণে সংযুক্ত হলেন। ভগ্নিত্বের, সখীত্বের চর্চা অন্তঃপুরে অবশ্যই ছিল কিন্তু শান্তিনিকেতনে ছাত্রীদের হস্টেল সেই ভগ্নিত্বকে এনে দিল ভিন্ন মাত্রা যেখানে তারা পরস্পরের সহযোগী। পেশাদার সম্পর্ক আর ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যবর্তী সীমারেখা এখানে নিয়েছে অন্য চেহারা। আবাসিকাদের আবাসজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এবং লিখিত স্মৃতি থেকে যে বয়ান পাওয়া যায় তাতে ভগ্নিত্ববোধ বহুল ভাবে প্রকাশিত। যার মূল বৈশিষ্ট্য ক্ষুদ্র আমি থেকে সমষ্ঠির আমির বিকাশ, সামাজিক পারিবারিক সম্পর্ক আর প্রাতিষ্ঠানিকতার ক্ষুদ্রত্ব থেকে মানবিকতায় উত্তরণ। গবেষণা পত্রটি কয়েকটি অংশে আলোচিত হয়েছে। প্রথম অংশে শান্তিনিকেতনে নারীশিক্ষার সূত্রপাত, নারীশিক্ষার হাত ধরে মেয়েদের হস্টেল নির্মাণ, দ্বিতীয় অংশে শ্রীসদন ছাত্রীনিবাসের গঠনের বিশেষত্ব, কার্যপ্রণালী, এই নির্মাণকে কেন্দ্র করে বিবিধ তর্ক

© Santiniketan Sahityapath

বিতর্ক আলোচিত হয়েছে। শেষাংশে রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শনের মানবতাবোধ ছাত্রীনিবাসে ভগ্নিত্ববোধে কীভাবে রূপ পেয়েছে আলোচিত হয়েছে।

শান্তিনিকেতনে নারীশিক্ষা এবং প্রথম মেয়েদের হস্টেল শ্রীসদন নির্মানের ইতিহাস:

শান্তিনিকেতনে সূচনাকাল থেকে নারীশিক্ষা প্রচলন এবং মেয়েদের হস্টেল নির্মাণের সময় ক্রম — শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ১৯০১ সালে, বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা — ১৯২১ সালে, নারীভবনের সূচনা ১৯২১ সালে, এরপর কিছু সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে যায় নারীভবন। এই সময় নির্মিত হয় বিচ্ছিন্ন কিছু ছাত্রীনিবাস — দ্বারিক, লেবুকুঞ্জ, নতুন বাড়ি ইত্যাদি (১৯২১-১৯২৯) কিছু সময়ের জন্য এগুলিও বন্ধ হয়। অবশেষে 'শ্রীভবন' নির্মিত হয় ১৯২৯ সালে। এই 'শ্রীভবন'পরবর্তীতে 'শ্রীসদন' ছাত্রীনিবাস হিসাবে পরিচিত হয়। এই 'শ্রীসদন' বিশ্বভারতীতে প্রথম মেয়েদের হস্টেল। আশ্রম শিক্ষার সূচনা থেকে মেয়েদের পড়াশোনার ব্যবস্থা না থাকলেও, রবীন্দ্রনাথ আশ্রমের কাজে মেয়েদের অংশগ্রহণের বিষয়ে আশাবাদী ছিলেন। মেয়েদের 'কল্যাণময়ী মূর্তি'র প্রভাবে আশ্রমের 'শ্রী' বিস্তারের কথা বলছেন। ছাত্রীরা পড়াশোনা ছাড়াও আরো নানা কাজে অংশগ্রহণ করছেন। একটা পরিসর পরিবারের বাইরে পিতৃতান্ত্রিক ঘেরাটোপের বাইরে গিয়ে তাঁরা নিজেদের জন্য পাচ্ছেন যা থেকে জন্ম নিচ্ছে অজস্র আবাস জীবনের স্মৃতিকথা। অমিতা সেন, রানী চন্দ, বাণী নিয়োগী প্রমুখের স্মৃতিকথায় শ্রীসদন একটি বিশেষ জায়গা নিচ্ছে। যার প্রবাহ থামে নি, সেই স্রোত থেকেই বহু পরবর্তীতে অহনা বিশ্বাস, ঋতা বসুর স্মৃতিকথা আমরা দেখেছি। সমাজের বাঁকা চোখের সামনে তৎকালে মেয়েরা হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করেছেন, বিভিন্ন কাজে অংশ নিয়েছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বিভিন্ন অবস্থানের মেয়েদের একত্রবাস শ্রীসদনকে রবীন্দ্র সমকালেই করে তুলেছিল একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ একটি পরিসর। বিশ্বভারতী সূচনাপর্বে নারী শিক্ষার প্রচলনে সেকালের উচ্চবর্গীয়, উচ্চবর্ণীয় নারী যারা বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের বাড়ির কন্যারা অংশ নিয়েছিলেন। রক্ষণশীল সমাজে এই অংশগ্রহণ ছিল বৈপ্লবিক নিঃসন্দেহে। তবে এই সূচনাপর্ব থেকে স্বাধীনতা এবং ১৯৫৬ সালে বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হওয়া অবধি নিম্নবর্গীয় নারীদের অংশগ্রহণ দেখা যায় না। তাঁদের অংশগ্রহণের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে সাংবিধানিক সংরক্ষণ পর্যন্ত।

১৩১৫ সালে নারী বিদ্যালয় শুরু হলে এই নারী বিদ্যালয় সম্বন্ধে ৩১ চৈত্র (১৩ এপ্রিল) মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "বিদ্যালয়টি বেশ পূর্ণ হয়ে এসেছে। ক্রমে এর পাশে একটি বালিকা বিদ্যালয়ের ছোট্ট চারা আপনিই গজিয়ে উঠেছে। এবং হু হু করে সেটা বেড়ে ওঠবার মতলব করচে। অনেকদিন থেকে মনে ইচ্ছা ছিল কিন্তু ভয়ে এগই নি — ঠাকুর যখন আপনি ঘরে এসেছেন পূজা না করে ত আর নিষ্কৃতি নেই।"[১] কিন্তু শান্তিনিকেতনের আদিপর্বে এই বিদ্যালয় বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। সূচনাপর্বে 'দেহলি', 'নতুনবাড়ি', 'দ্বারিক' 'লেবুকুঞ্জ ইত্যাদি যেসব বাড়ি একদিন ছাত্রীনিবাস রূপে ব্যবহৃত হয়েছিল, একমাত্র 'দেহলি এবং 'নতুনবাড়ি' ছাড়া অন্যান্য বাড়িগুলি আর এখন দেখা যায় না। কালের স্রোতে এবং প্রয়োজনের তাগিদে এই ঘরগুলি অবলুপ্ত হলেও অতীতের বহু বিদগ্ধ মানুষ এবং প্রাচীন আশ্রমিকদের অনেকের লেখায় পুরাতন ছোটো ছোটো ছাত্রীনিবাসগুলির নানান স্মৃতি আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে।

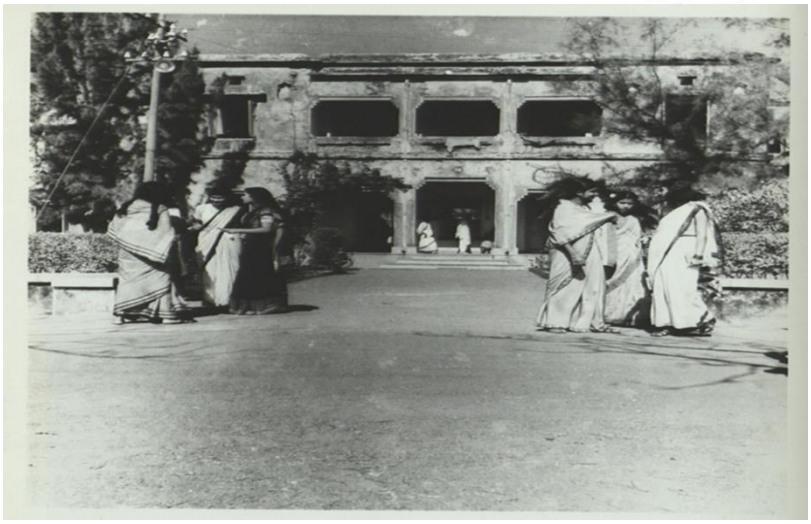

শান্তিনিকেতনের প্রথম মেয়েদের হস্টেল শ্রীসদন, চিত্রগ্রাহক শম্ভু সাহা, রবীন্দ্রভবন চিত্রসংগ্রহশালা থেকে গৃহীত

নারী শিক্ষার প্রাক্‌কালে তাঁকে নানাভাবে বিব্রত হতে হয়েছিল। তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজ এই নারীশিক্ষা খুব সহজ ভাবে নেয় নি। সমালোচনা আর বাধাবিপর্যয়ে প্রথম যুগে নারীবিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়।

© Santiniketan Sahityapath

আবার শুরু হয় রবীন্দ্রনাথের অসীম আগ্রহে।'শ্রীভবন সম্বন্ধে আমার আদর্শ' প্রবন্ধে আশ্রমপিতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতীতে নারীশিক্ষা ও মেয়েদের হস্টেলের বিষয়ে তাঁর মনোভাব সম্যক প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সমসময়ের শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বিশ্বভারতী নিউজ, শান্তিনিকেতন পত্রিকা, এছাড়াও রবীন্দ্র জীবনী, রবিজীবনী এবং রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে শান্তিনিকেতনে মেয়েদের পড়াশোনা এবং হস্টেল নির্মাণ কালীন তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনার হদিশ পাওয়া যায়। আশ্রমের সূচনাপর্বের নারীবিদ্যালয় এবং ছাত্রীনিবাস 'দেহলি', 'নতুনবাড়ি, 'দ্বারিক', 'লেবুকুঞ্জ' এই ছাত্রীনিবাসগুলি কীভাবে একত্রিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শান্তিনিকেতনে মেয়েদের প্রথম হস্টেল 'শ্রীভবন' যা পরবর্তীকালে 'শ্রীসদন' নামাঙ্কিত হয়। ১৯৩০ সালে বিদেশ ভ্রমণে যাবার আগে রবীন্দ্রনাথ নারীশিক্ষা বিষয়ে তাঁর ভাবনা চিঠিতে লেখেন হেমবালা সেনকে। চিঠিটি উল্লিখিত হলো — "কল্যাণীয়াসু হেমবালা, আমাদের আশ্রমের মেয়েদের আসনটি আর একবার নতুন যত্নে নির্মলসুন্দর ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করে গেলুম। নিশ্চই জেনো, আশ্রমের প্রাণ প্রতিষ্ঠার ভার মেয়েদের পরেই। পুরুষেরা শুষ্ক নিয়মকে বড়ো বলে জানে। স্বভাবতই প্রাণের নিয়মকে মেয়েরা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে থাকে। এই জন্যই আশ্রমের মেয়েদের স্থানটিকে এত যত্নে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস পেয়েছি। তোমরা আমার প্রত্যাশা পূর্ণ করবার চেষ্টা করবে এই বিশ্বাস মনে নিয়ে আমি বিদায় নিলুম। তোমরা আমার একান্ত মনের আশীর্বাদ গ্রহণ করবে। ইতি ২৮ ফেব্রুআরি ১৯৩০ শুভাকঙ্ক্ষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"[২]

শ্রীসদনের গঠন শৈলী:

শ্রীসদন গৃহটির গঠন শৈলী নির্মাণ করেছিলেন সুরেন কর। আশ্রম প্রাঙ্গণের অন্যান্য বাড়ির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি হয়েছিল এই ছাত্রীনিবাস। প্রবেশপথে ঢুকলেই নজরে পড়ে ছোটোবড়ো তিনটি খিলানযুক্ত খাঁজকাটা সুবিস্তৃত বারান্দা। বারান্দার দুপাশে দুটি নাতিদীর্ঘ একজন থাকার সবরকম ব্যবস্থা যুক্ত আবাস গৃহ। এখানেই থাকতেন ভারপ্রাপ্তা পরিদর্শিকাগণ। প্রয়োজনবোধে এইখানেই এসেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছাত্রীনিবাস পরিদর্শনে বা ছাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার্থে। বারান্দার সঙ্গে সুদীর্ঘ একটি বসার ঘর। উপরের ব্যবস্থাও ঠিক এইরকম। বড়ো বড়ো জানলার সবকটিই গরাদহীন যা এখন কল্পনা করাই যায় না। নিরাপত্তার দাবিতে আজ সর্বত্রই জাল দেওয়া। একটু লক্ষ করলেই এ বাড়ির বিশেষ ধরনের ছাদটি পুরনো দিনের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যকে মনে করিয়ে দেয়। সুউচ্চ ভিত-সহ এ-বাড়ির উচ্চতা সহজেই সবার নজর পড়ে। ঢোকার পথে এ বাড়ির নির্মাণ বৈচিত্র্য সে যুগের আভিজাত্যপূর্ণ বড়ো বাড়ির কিছুটা আদল আছে। পরবর্তীকালে তৈরি রানী বিড়লালয়, মনোরমা গোয়েঙ্কালয়, কলাভবন এবং সংগীতভবনের দক্ষিণ প্রান্তে পূর্বমুখী আনন্দসদন, প্রতিটি বাড়িই তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হলেও 'শ্রীভবন' ছাত্রীনিবাসের গঠনশৈলীর এমন একটি ছাপ আছে যা অন্য সব বাড়ির তুলনায় কিছুটা ভিন্ন ছাঁদের। এ বাড়ির নির্মাণের প্রথম যুগে বাড়িটির আশেপাশে দিগন্তবিস্তৃত গাছপালা বিহীন দুস্তর প্রান্তর ছাড়া আর কিছু নজরে পড়তে না তখন আবাসিকা ছাত্রীদের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়।[৩] শ্রীসদন বাড়ির সুউচ্চ দেওয়ালের উপরের দিকে নজর দিলেই দেখা যায় প্রতি দেওয়ালের উপরিভাগে দু-তিনটি ছোটো ছোটো সুদৃশ্য প্রকোষ্ঠ এর শোভা বৃদ্ধি করে আজও বিদ্যমান। এ ধরনের প্রকোষ্ঠ সিংহসদনেও দেখা যায়।

শ্রীসদনের অতিথিশালায় দেয়ালচিত্র, নিজস্ব চিত্র, ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন চিত্র

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর পরিচালনায় 'শ্রীভবনের' বসার ঘর এবং শ্রীভবনের প্রবেশপথের দেওয়াল অলংকরণ ম্লান হয়ে গেলেও আজও বিদ্যমান। সেদিনের আবাসিক ছাত্রীদের মধ্যে চিত্রনিভা চৌধুরী, অনুকণা দাশগুপ্ত, সাবিত্রী গোবিন্দ, গীতা রায়, মন্দিরা গুপ্ত, যমুনা বসু, রানী চন্দ, নিবেদিতা ঘোষ প্রমুখ গুণী ছাত্রীদের পরম নিষ্ঠা এবং যত্নে অঙ্কিত দেওয়াল চিত্র আজও কলাশিল্পীদের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দেয়।

© Santiniketan Sahityapath

শ্রীসদনের অতিথিশালায় দেয়ালচিত্র, নিজস্ব চিত্র, ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন চিত্র

১৯৩২ সালে বিশ্বভারতী নিউজ ডিসেম্বরে লেখা হচ্ছে — "The decoration of the walls of the reception room of Sree Bhavana Girls' hostel which began in the last session has been just completed. All the work has been done by the following students of Kala Bhavana, Chitralekha Choudhury, Anukana Dasgupta, Sabitri Gobind, Gita Roy, Mandira Gupta, Jamuna Bose, Rani Chanda and Nibedita Ghose. The frist five have left the Bhavana on the completion of their studies."[৪]

শ্রীভবনের প্রবেশপথ মাত্র একটি। সুবিস্তৃত সামনের বারান্দার বাম পাশ দিয়ে ঢুকেই বাঁ হাতেই পড়ে খোলা বারান্দা যা বর্তমানে সাইকেল রাখার বারান্দা নামে পরিচিত। অমিতা সেনের লেখা থেকে যায় যে-কোনো একদিন এক বিশেষ কারণে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শ্রীভবনের ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলার জন্য এই বারান্দাতেই এসে বসেন। এই বারান্দার সংলগ্ন বাঁ হাতের ঘরখানিকে বলা হয় 'পুতুলঘর'। পাঠভবনের শিশুছাত্রীদের উপযোগী নানা ধরনের হাতে তৈরি পুতুল-সহ একটি আলমারি ছিল এই ঘরে।[৫] এই ঘরে এসেছেন এবং আতিথ্য গ্রহণ করেছেন প্রাক্তন ছাত্রী ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, সোনিয়া গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। এই ছাত্রীনিবাসের আসবাবপত্রগুলিও ছিল অতি সাধারণ। ২৬ জুলাই ১৯৯৭ সালে দেশ পত্রিকায় অরুণেন্দু বন্দোপাধ্যায়ের লেখা 'রবীন্দ্রনাথের ডিজাইন ভাবনা' নামে প্রবন্ধ থেকে জানা যায় রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষাকৃত কম খরচে শক্ত পোক্ত দৃষ্টিনন্দন এবং দীর্ঘস্থায়ী হবে এমন আসবাবপত্রের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছাড়াও ছাত্রছাত্রীদের আসবাবপত্রের কিছু বিন্যাস রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় স্থান পায়। শ্রীভবনের আসবাবপত্রের ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠাতা আচার্যের প্রভাব কিছুটা ছিল বলে মনে করা হয়। বাহুল্যবিহীন আসবাবপত্র-সহ শ্রীসদনের ঘরগুলির প্রতিটিতে ছিল ছয় জন করে থাকার ব্যবস্থা। একখানি মজবুত তক্তা, পড়ার জন্য একটি উঁচু টুল, একটি টেবিল আর সবাইকে আলাদা তাক না দিতে পারায় দেওয়ালের তাক ভাগ করে সবাইকে ব্যবহার করতে হতো। পাঠকক্ষে মাটিতে বসে পড়ার রীতিতে অপেক্ষাকৃত নিচু পালিশ করা লম্বা ধরনের কাঠের বড়ো পাটাতন ছিল। তার সঙ্গে উপযুক্ত লম্বা ধরণের ছটি টেবিলে বসে প্রায় ত্রিশ জন ছাত্রী পাঠাভ্যাস করতে পারত। ১৯৩৬-৩৭ সাল নাগাদ শ্রীভবনে ছাত্রীদের পাঠানুশীলন কার্যক্রম শুরু হয়। 'শ্রীভবন সম্বন্ধে আমার আদর্শ', 'My ideals with regard to the Sree Bhavana' — প্রবন্ধগুলিতে শ্রীভবন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ভাবনা বর্ণিত হয়েছে। সাধনা করের লেখা, "আমাদের গুরুদেব" প্রবন্ধ থেকে জানা যায় কবিগুরু একদিন শ্রীভবনের সব মেয়েদের ডেকে বলেছিলেন, "তোমাদের বাসস্থানকে আমি নাম দিয়েছি 'শ্রীভবন'। শ্রী মানে লক্ষ্মী — লক্ষ্মী শুধুমাত্র ধনের প্রতীক নন তাঁর থেকেও বড়ো শ্রীরূপিণী মেয়েরা লক্ষ্মী। কারণ শ্রীতে তাদের জন্মগত অধিকার। বিলাসিতায় নয়, শ্রীতে মণ্ডিত হয়ো তোমরা।"[৬] নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতীয় নারীর শিক্ষাদর্শ সর্বতোভাবে বজায় রেখেই কবি বাস্তবজীবনের প্রয়োজনীয় সবরকম আধুনিক শিক্ষাকে নারীশিক্ষায় স্থান দিয়েছিলেন। তা ছাড়া তাঁর পরিবারের উন্নত কৃষ্টি এবং নারীজীবনের উন্নত দীপ্ত গরিমা তাঁকে অনেকাংশে নারীশিক্ষায় অগ্রসর ভুমিকা গ্রহণে সাহায্য করেছিল।

বিদ্যাশিক্ষার ঊর্ধ্বে 'কল্যাণময়ী' আশ্রমকন্যারা ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থকে জয় করে সমগ্র আশ্রম পরিবেশকে নিজেদের প্রাণের সম্পদের বিনিময়ে গড়ে তুলবে এই ছিল তাঁর আশা। নিরাশ হয়েছেন কখনো। এই সব তিক্ততার ঊর্ধ্বে নারীশিক্ষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন প্রায় সারাজীবন। কলাভবনের ছাত্রী হয়ে এসেছিলেন শ্রীভবনের আবাসিকা সাবিত্রী গোবিন্দ। শ্রীভবনের অন্যতমা আবাসিকা কলাবিভাগের ছাত্রী চিত্রনিভা চৌধুরী এসেছিলেন ১৯২৮ সালে। পরবর্তীকালে তিনি আসেন অধ্যাপিকা রূপে। শ্রীভবনের দেয়ালচিত্র নন্দলাল বসুর নির্দেশনায় কয়েকজন ছাত্রী করেছিলেন। শ্রীভবনের বড়ো জানলাগুলি ছিল একেবারে খোলা এবং গরাদহীন। সেখান দিয়ে অনায়াসেই যে-কোনো ছাত্রী ভারপ্রাপ্তা দিদির অগোচরে জানালা টপকে বেরিয়ে পড়তে পারতেন। এ বিষয়ে সাবিত্রী দেবী স্মৃতিকথায়

© Santiniketan Sahityapath

লিখেছেন। শ্রীসদনের তৎকালীন প্রণেত্রী হেমবালা দেবী মেয়েদের নিরাপত্তার কথা ভেবে রবীন্দ্রনাথকে নবনির্মিত গরাদবিহীন জানলা সম্বন্ধে তাঁর আপত্তির কথা জানালেন, এতজন মেয়ের দায়িত্ব নিয়ে থাকেন চারিদিকে ফাঁকা একখানা বিশাল বাড়িতে। এ বিষয়ে তিনি তাঁর দুশ্চিন্তার কথা গুরুদেবকে জানিয়ে অন্তত শ্রীভবনের চারিদিকে একটি বাউন্ডারি ওয়াল দেওয়ার কথা জানালে কবি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন — "কি! আমি কি এখানে জেলখানা তৈরি করব মেয়েদের তাতে আটকে রাখার জন্যে? না তা কিছুতেই হবে না।"[৭]

গরাদবিহীন শ্রীসদনের জানালা, চিত্রগ্রাহক শম্ভু সাহা, রবীন্দ্রভবন ছবি সংগ্রহশালা থেকে গৃহীত

তিনি আরো বলেন, "আমাদের মেয়েরা খুব ভালো, আমি ওদের বিশ্বাস করি যে ওরা নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে, এ ছাড়া ওদের সঙ্গে সোনাদানা কিছুই নেই।"[৮] ১৯২২-২৩ সালের প্রায় ছয় দশক পরেও ছাত্রীনিবাসের নিরাপত্তার দাবীতে বিশেষ অনুরোধের ফলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মতামত ও রবীন্দ্রনাথের মতোই ছিল — "আবাসনের খোলা বারান্দা জাল দিয়ে ঘিরে কি শ্রীসদনে জেলখানা তৈরি হবে?"[৯] এই কথাই শুনেছিলেন সেদিনের ভারপ্রাপ্তা পরিদর্শিকা। যে বেড়াজাল যে বেষ্টনীর প্রতি কবির এত অনীহা ছিল প্রয়োজনের তাগিদে নিরাপত্তার দাবীতে সেখানে সর্বত্রই তারের বেড়া, লোহার বেষ্টনী অথবা উচ্চ প্রাচীর। শ্রীসদনের বর্তমান প্রাচীর সুদৃশ্য এবং কারুকার্যখচিত জালির কাজ করা অপেক্ষাকৃত নীচু, বর্তমানে শ্রীসদনের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। ভিতরে অসংখ্য বৃক্ষের মাঝে বিভিন্ন ভবনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্লক।

শ্রীসদনের কার্যপ্রণালী:

শ্রীভবনের সমবেত জীবনই ছিল এর মূল আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য। সেখানে ছাত্রী, কর্মী, পরিদর্শিকারা সবাই ছিলেন এক পরিবারভুক্ত, সবাই সাবার প্রতি একান্তভাবেই সহানুভূতি ও দরদী ছিলেন, দৈনন্দিন জীবনের সব কাজই করতে হতো সবাইকে নিজে হাতে। জাপানী প্রথায় যুযুৎসু শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের আত্মরক্ষায় বলীয়ান করে তুলতে চেয়েছিলেন। রানী চন্দের 'সব হতে আপন' বইতে শ্রীভবন সম্পর্কে মনোগ্রাহী বর্ণনা রয়েছে। সেদিনের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা কীভাবে পরিচালিত হতো, ছাত্রীদের পঠন-পাঠনের কাজ প্রাতঃকালে উপাসনার মধ্য দিয়ে কী ভাবে আরম্ভ হতো, কীভাবে সারাদিনের কার্যক্রম ঘণ্টার তালে তালে সম্পাদিত হতো, কী কী কাজ নিয়ে হাতে করতে হতো, সবকিছুর এক সামঞ্জস্যপূর্ণ বিবরণে সেদিনের শ্রীভবনের একান্ত সহজ সরল শৃঙ্খলাবদ্ধ আড়ম্বরহীন জীবনকে তুলে এনেছেন 'সব হতে আপন'[১০] বইতে। রানী চন্দ এবং তাঁর দিদি অন্নপূর্ণা শান্তিনিকেতনে শিক্ষা লাভের জন্য এসেছিলেন। রানী চন্দ কলাভবনে এবং অন্নপূর্ণা সংগীত ভবনে ভর্তি হয়েছিলেন। খুব বেশি দিন শ্রীভবনে না থাকলেও রাণী চন্দ তাঁর স্মৃতিকথায় শ্রীভবনের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মনোজ্ঞ প্রাঞ্জল বর্ণনা দিয়েছেন। সকাল সন্ধ্যায় নিয়মিত মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে শুরু হতো আশ্রম বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কর্ম পরিক্রমা। অতি প্রত্যুষে ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শয্যা ত্যাগের পর ছাত্রীদের লণ্ঠনের আলোতে বিছানাপত্র তুলে ঘরদোর

পরিষ্কার করে তখনি চৌবাচ্চার তোলা জলে স্নান সেরে প্রাতঃ-উপাসনার জন্য তৈরি হতে হতো। হ্যারিকেনের আলোতে চলত সেদিনের সব কাজ — লণ্ঠন পরিষ্কার, আলো জ্বালানো সব কাজ উচ্চশ্রেণির ছাত্রীরা করত। জলের কলের ব্যবস্থা না থাকায় আশ্রম প্রাঙ্গণে ছোটো ছোটো কয়েকটি অগভীর কুয়ো ছিল। জলের অভাব দূর করার জন্য সুরেন কর একটি বিরাট কুয়ো তৈরি করেন। বিদ্যুৎবিহীন হস্টেলে হ্যারিকেনের আলোয় ছাত্রীনিবাসের যাবতীয় কাজ চলত। সকালে ঘণ্টা পড়ার পর প্রত্যেক ছাত্রীকেই ঘরের কোথাও স্থির চিত্তে কিছুক্ষণ বসতে হতো তারপর পরের ঘণ্টাটি পড়ার পর সবাই একত্রে শ্রীভবনের সামনে একত্রিত হয়ে সমবেত প্রার্থনা করতেন — "ওঁ পিতা নোঽসি, পিতা নো বোধি, নমস্তেস্তু, মা, মা হিংসীঃ"। সুরেন করের স্ত্রী রমা কর শ্রীভবনের মেয়েদের গান শেখাতেন। আশ্রমজীবনের একেবারে প্রথম যুগের ছাত্রীরা শিক্ষান্তে অনেকেই নারীশিক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্নধর্মী মনোভাব, আচার আচরণে অভ্যস্ত ছাত্রীদের শ্রীসদনে থাকাকালীন কিছু কিছু আচরণ কবিকে কখনো কখনো ব্যথিত করেছিল। ১৯২৯ সালের ৭ মার্চ বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্রী এবং শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কন্যা নুটুকে রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে লিখছেন —

কল্যাণীয়াসু

নুটু, বিদেশে আসবার মুখে নারীবিভাগ সম্বন্ধে মনের মধ্যে অনেকখানি দুশ্চিন্তা বহন করে এনেছিলাম। এটা আভাসে বোঝা গিয়েছিল যে নারীভবন সমস্ত আশ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা প্রীতি ও নিষ্ঠা বহন করে তার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হতে পারে নি। তোদের অনেকেই বলেছিলি মেয়েদের প্রশ্রয় দিয়ে তাদের সমস্ত বিধি বিধানের অতীত করে দিয়েছি, তারা আত্মত্যাগে অসমর্থ হয়ে পড়েছে, নিজেদের ছোটোখাটো সুবিধের দিকেই তাদের সমস্ত চেষ্টা সংহতো হয়েছে।... মেয়েদের সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা আছে আমি বরাবর বিশ্বাস করে এসেছি তারা স্বভাবতই আপনার জীবন দিয়ে আমাদের আশ্রমকে গড়ে তোলবার কাজে লাগবে। এই তাদের ধর্ম। দীর্ঘকাল চলে গেছে ক্রমশই তাদের ঔদাসিন্যে আমাকে পীড়িত করছে।[১১]

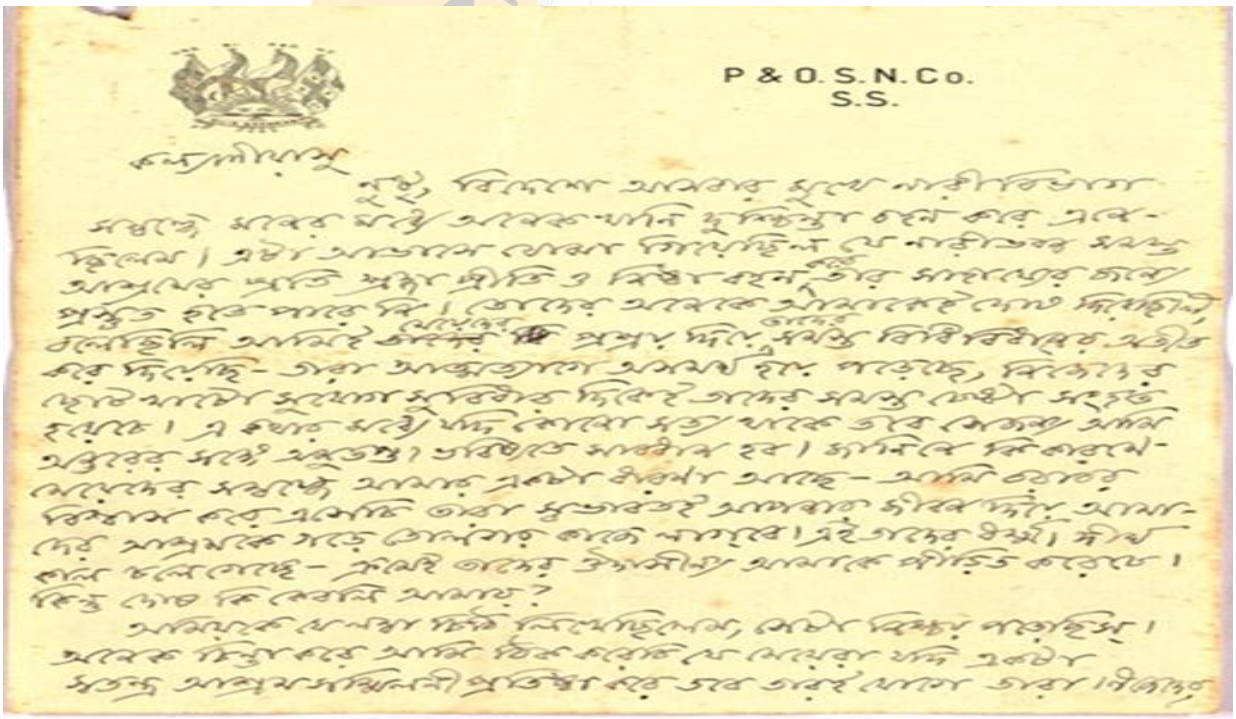
P & O. S. N. Co.
S.S.

হেমবালাদেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি। রবীন্দ্রভবন চিঠি সংগ্রহশালার সৌজন্যে প্রাপ্ত

সেকালের পুরনো ছাত্রী শৈলনন্দিনী দেবীর লেখা, "গুরুদেবের আশ্রমে ছাত্রী জীবন" প্রবন্ধে শ্রীভবনে অতিথি সেবা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবটি ফুটিয়ে তুলেছেন বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখে। তিনি অতিথি আপ্যায়নে সুস্বাদু খাবার প্রদানের সঙ্গে সাংস্কৃতিক দিকটিও নজরে রাখতে বলেছিলেন। আবাসিকারা অসুস্থ হলে তার বন্ধুরা পালাক্রমে সারারাত জেগে সেবা করত। কবি অসুস্থ ছাত্রীকে যেমন দেখতে আসতেন তেমনি সেবা করত যে মেয়েরা তাদের জন্য যথাযথ খাবারের ব্যবস্থা করতেন। এভাবে ছাত্রীদরদী শিক্ষাগুরু

© Santiniketan Sahityapath

রবীন্দ্রনাথ পঠন-পাঠনের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে রোগীর সেবা, অতিথি আপ্যায়ন ইত্যাদি নানাবিধ দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় প্রয়োজনীয় শিক্ষায় সেদিনের ছাত্রীদের সুশিক্ষিত করে তুলেছিলেন। তিনি শ্রীভবনের ছাত্রীদের শ্রীনিকেতনে নিয়ে গিয়ে বাগান করার বিষয়েও শিক্ষা দিয়েছিলেন। মাস্টারমশাইরা ছাত্রীদের শ্রীনিকেতনে নিয়ে গিয়ে গুটিপোকার চাষ, আখের ক্ষেত দেখাতেন, তেমনি বর্ষাকালে একহাঁটু জলে দাঁড়িয়ে বাকীদের সঙ্গে ধানের চারা পোতার কাজেও উৎসাহিত করতেন। পুঁথিগত বিদ্যার পাশে পাশে নিজের আশপাশ ও গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে যাতে পরিচয় হয় তাই এই প্রচেষ্টা। প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে একাত্মতাবোধ সৃষ্টির জন্য এই প্রচেষ্টা। শ্রীনিকেতনের গ্রামোন্নয়ন ও পল্লী সংগঠনের কাজের সঙ্গে যাতে শ্রীভবনের ছাত্রীরা যুক্ত হতে পারেন এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমস্ত কাজকর্মে ছাত্রছাত্রীরা যাতে স্বাবলম্বী হতে পারেন এ বিষয়ে কবির দূরদৃষ্টি ছিল। ধীরে ধীরে মেয়েদের মধ্যে পরিবর্তন আসছিল। সাজে পোশাকে, আচার আচরণে আশ্রম পরিবেশ থেকে ভিন্ন হয়ে উঠছিল। ভারপ্রাপ্তা হেমলতা দেবী সামলে উঠতে পারছিলেন না। তাঁর ছাত্রীনিবাস পরিচালনা সম্পর্কে শান্তিনিকেতন — বিশ্বভারতী পত্রিকায় ২২৪ পাতায় লেখা হচ্ছে — "ছাত্রীদের প্রতি তিনি যেমন দরদী ছিলেন তেমনই নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রক্ষায় কঠোর ছিলেন। এই কঠোরতা কাহারও কাহারও মনে হইত অতিরিক্ত নীতিপরায়ণতা মাত্র। বালিকাদের পক্ষে অসময়ে বাহিরে যাওয়া আসা সম্বন্ধে যে সব নিয়ম প্রত্যেক হস্টেলে আছে তাহা কর্তব্য বোধেই পালন করিতেন। তাহাতে সকলে সন্তুষ্ট ছিলেন না।"[১২] হেমলতা দেবী শেষ অবধি পদত্যাগ করেন।

শ্রীভবনের প্রথম যুগের ভারপ্রাপ্তা পরিদর্শিকা স্নেহলতা সেন, হেমবালা দেবী শ্রীভবনের মেয়েদের সন্তানস্নেহে আগলে রেখেছিলেন। বাড়ির স্নেহ মমতার বন্ধনকে ফেলে আসা ছাত্রীদের মনের কথা তাঁরা সর্বদাই মনে করতেন। নিঃস্বার্থ, সংবেদনশীল, স্নেহশীলা পরিদর্শিকাদের অবদানে শ্রীভবন তৎকালীন শান্তিনিকেতনে একটি বিশেষ রূপ পেয়েছিল। হেমবালা দেবীর অবসর গ্রহণের পর কবিপুত্রবধূ প্রতিমা দেবী ১৯৩৮ সালের ৫ জুলাই ছাত্রীনিবাসের পদে অধিষ্ঠিত হন। বিশ্বভারতী সংবাদে তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় — "Sreejukta Pratima Devi takes complete charge of the Sree Bhavana as pranetri from the 5th July, 1934 and she will be assisted by Hembala Devi resident Paridarsika of Sree Bhavana"[১৩] প্রতিমা দেবী প্রনেত্রীর পদ অলংকৃত করলেও আবাসিক পরিদর্শিকারূপে শ্রীভবনের দায়িত্বে ছিলেন কবির ব্যক্তিগত সচিব অমিয় চক্রবর্তীর স্ত্রী হৈমন্তী চক্রবর্তী। ডেনমার্কের কন্যা হিয়রডিস সিগার ১৯২৭ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভারতে আসেন, জাহাজেই কবি তাঁর নাম দেন হৈমন্তী। নিয়মিত পঠন পাঠনের সঙ্গে শ্রীভবনের ছাত্রীদেরও শ্রীনিকেতনের বয়নশিল্প শিক্ষাকেন্দ্রে যোগদানের ব্যবস্থা ছিল। তখন শ্রীভবনই ছিল একমাত্র ছাত্রীনিবাস যেখানে দেশবিদেশের ছাত্রীরা রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে শিক্ষার্থী হিসাবে এখানে জড়ো হয়েছিলেন। "শ্রীভবন সম্বন্ধে আমার আদর্শ" প্রবন্ধে তিনি লিখছেন, "এখানে ছাত্রী নেত্রী ও পরিচারিকারা মিলে একটি ঘনিষ্ঠ সামাজিক সম্বন্ধ গড়ে তুলবে। এই কথা মনে রাখতে হবে শ্রীভবনটি কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা দল বিশেষের গড়ে তোলা সামগ্রী নয়; যারা যারা এখানে আছে তারা সকলেই আপন প্রাণের যোগে প্রতিদিন একে প্রাণবান করে রাখবে। এর মধ্যে একান্ত যত্নে সৌন্দর্য, নির্মলতা সুব্যবস্থা ও ভদ্র আচার সঞ্চার করে দিয়ে তারা যেন এর জন্যে মনে মনে গৌরব অনুভব করতে পারে।"[১৪] তিনি শ্রীভবন সম্পর্কে আরো বলেছেন — "সংক্ষেপে আমার বক্তব্য এই যে, শ্রীভবনের দায়িত্ব স্বীকার করে স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠিত করা, সৌজন্য রক্ষা করা, পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্য পালন করা, সুব্যবস্থা ও সুশৃংখলতা অক্ষুণ্ণ রাখা দ্বারা শ্রীভবনে সৌন্দর্য ও কল্যাণের উচ্চ আদর্শ সৃষ্টির ভার প্রধানত ছাত্রীদের নিজের পরেই। নিজের প্রাণের যোগে এই সৃষ্টিকর্ম সাধন করতে থাকলে স্বভাবতই এ জায়গাটি তাদের আপন হয়ে উঠবে, একে ভালোবাসতে পারবে এবং সেই ভালোবাসার প্রণালী দিয়ে এখানকার শ্রেষ্ঠ দান তারা অন্তরের মধ্যে সহজে গ্রহণ করতে পারবে।"[১৫]

'শ্রীভবন সম্বন্ধে আমার আদর্শ' এই প্রবন্ধটি ছাড়াও 'শ্রীভবন — ছাত্রীদের পালনীয় কর্তব্য' এ ছাত্রীনিবাসের মেয়েদের পালনীয় কিছু নির্দেশ ও নিয়মাবলি প্রণয়ন করেন। তৎকালীন রক্ষণশীল বাঙালি পরিবারের অবরোধ প্রথা থেকে বেরিয়ে আশ্রমে আবাসিক ছাত্রীরা যাতে অতিরিক্ত স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে সমাজকে সমালোচনার সুযোগ না দেয় সেই সতর্কতা থেকেই এই নিয়মগুলি

প্রণয়ণ করেন। কবি ছাত্রীদের পালনীয় কর্তব্য সমূহের বিস্তারিত বিবরণ লিখেছিলেন — কয়েকটি উল্লেখ করা হলো — ১। প্রাতে উঠিবার ঘণ্টা পড়িলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে ছাত্রীরা লাইনে সমবেত হইবে। ২। তারপর প্রাতঃকৃত্য, ঘর পরিষ্কার করা, বিছানা গুছাইয়া রাখা, ব্যায়াম ও স্নান করণীয়। ৩। প্রথমে আপন আপন কাপড় কাচিয়া নির্দিষ্ট স্থানে মেলিয়া দিবে। ক্লাশ শেষ হইলে শুকনো কাপড় তুলিয়া রাখিবে। ৪। বিছানা, বইখাতা, লিখিবার সামগ্রী, কাপড়চোপড় পরিপাটি ও ঘরের মেঝে নির্মল করিয়া রাখা অবশ্য কর্তব্য। ৫। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর এক ঘণ্টা বিশ্রামের জন্য নির্দিষ্ট। তাহার পরে পাঠচর্চার সময় সেই সময় কোনো সুস্থ ছাত্রী বিছানায় থাকিবে না বা বিনা অনুমতিতে বাহিরে যাবে না। ৬। নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত কারখানা, রান্নাঘর, গ্রন্থভবন, কলাভবন, আরোগ্যভবন, সিংহসদন, খেলার মাঠ অর্থাৎ শ্রীভবনের বাহিরে কোথাও বিনা অনুমতিতে যাওয়া নিষিদ্ধ। পরিদর্শিকার অনুমতি ব্যতীত কাহারও বাড়িতে নিমন্ত্রণ যাওয়া নিয়ম বিরুদ্ধ। ৭। আহারের পূর্বে হাত মুখ ধুইয়া সময় অতিক্রম না করিয়া ভোজনশালায় নিজের নির্দিষ্ট আসনে বসিবে। তৎকালে ভোজ্যপদার্থের আলোচনা পরিহার্য। পরস্পর বাক্যালাপ মৃদুস্বরে কর্তব্য। আহার ব্যাপার যেন অশোভন অসংযত ও অপরিস্কৃত না হয়। ৮। রাত্রে শুইতে যাইবার পূর্বে সম্মিলিত উপাসনায় যোগ দিবে। পরে পা ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া শুইতে যাইবে। বিছানায় যাইবার পূর্বে পরদিন প্রাতঃকালের ব্যবহার্য কাপড় গামছা আসন খাতা গুছাইয়া রাখিবে। ৯। আত্মীয় স্বজন অধ্যাপক ও সহপাঠী ছাত্রদের সহিত দেখা করিবার আবশ্যক হইলে পরিদর্শিকার অনুমতিক্রমে যথানির্দিষ্ট ঘরে ও সময়ে ও নির্দিষ্ট পরিমাণ কাল ধরিয়া দেখা করিতে পারিবে। অন্য সময়ে বা দীর্ঘকালের জন্য দেখা করার প্রয়োজন হইলে কর্তৃপক্ষের অনুমতি আবশ্যক। ১০। রাত্রি আটটার পর শ্রীভবনের বাহিরে থাকা অনিয়ম। কোনো কারণে বিলম্বের সম্ভবনা থাকিলে পরিদর্শিকার অনুমতি চায়।

এইসময় প্রতিমা দেবী শ্রীভবনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেদিনের আশ্রমকন্যা নন্দিতা কৃপালনি, গৌরী দেবী, যমুনা দেবী, খুকু অমিতা সেন, সুকৃতি চক্রবর্তী, সেবা মিত্র, মমতা, সুনীপা অণু চক্রবর্তীর কথা সুকৃতি চক্রবর্তীর স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায়। এই আশ্রমকন্যা ও তদানীন্তন শ্রীভবনের আবাসিক ছাত্রীদের নৃত্য পরিবেশনায়, তাঁদের অঙ্গসজ্জায় এমন কি মঞ্চসজ্জার ক্ষেত্রেও প্রতিমা দেবীর অনুপম শিল্পবোধ, সূক্ষ্ম অনুভূতি ও নানান কলাকুশলতার পরিচয় মেলে। প্রতিমা দেবী শ্রীভবনের দায়িত্বে আসায় শ্রীভবনের এক বিশেষ অধ্যায়ের সূচনা হলো। সুধীরচন্দ্র কর মহাশয়ের লেখা থেকে জানা যায় প্রতিমা দেবী নৃত্যে নানারকম কলাকৌশল রূপ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন, নন্দলাল বসুর কন্যা গৌরীদেবী 'নটীর পূজা' র নৃত্যরূপ দিলেন ১৯২৭ সালে, তা সারা দেশে সাড়া ফেলেছিল। কবির ৭০তম জন্ম বার্ষিকী উৎসবে 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যটি পরিচালনা করলেন প্রতিমা দেবী। এর মাধ্যমেই শুরু হলো নৃত্যনাট্যের সূচনা। নারীশিক্ষা প্রসারের সঙ্গে ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ক্রমে আশ্রম প্রাঙ্গণের সমুদয় ছাত্রীনিবাসের একত্রীকরণেই সৃষ্টি হয়েছিল এই সুবিস্তৃত ছাত্রীনিবাসটি।

শ্রীসদন কেন্দ্রিক তৎকালীন সমাজের সমালোচনা ও বিতর্ক:

দেশবিদেশের ছাত্রীরা নিয়ে এলেন আশ্রমে চলাফেরার স্বাচ্ছন্দ্য আর ভিন্ন দেশ তথা ভারতের অন্য প্রান্ত থেকে বিচিত্র সংস্কৃতির প্রভাব। নারী জাগরণের উন্মাদনায় আলগা হলো নিয়মের কড়াকড়ি। আশ্রমের কাজে যোগ দিলেন কিছু সংখ্যক বিদেশিনী নারী। কেউ এলেন শিখতে, কেউ এলেন শেখাতে। আশ্রমের গুরুপত্নীরাও কর্মযজ্ঞে এগিয়ে এলেন। রবীন্দ্রনাথ সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণের বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। তাঁর উদ্যোগে মেয়েরা পড়াশোনার পাশাপাশি তারা নাচ গান নাটক ইত্যাদিতেও সক্রিয় অংশ নিত। এই অংশগ্রহণ এবং তাতে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা এই বিষয়টি নিয়ে সমকালে তীব্র সমালোচনা হয়েছিল। আধুনিক, উদার ভদ্র পরিবারের শিক্ষিত মেয়েদের এই সামাজিক অংশগ্রহণ সমাজ যেমন ভালো চোখে দেখেনি তেমনি রবীন্দ্রনাথকেও সহ্য করতে হয়েছিল অজস্র ব্যাঙ্গাত্মক আক্রমণ। ছাত্রীদের জন্য হস্টেল নির্মাণ ও তৎকালের মেয়েদের সার্বিক বিকাশের জন্য নেওয়া পদক্ষেপের একটি ছিল। বিশ্বভারতীর প্রথম মেয়েদের হস্টেল শ্রীসদন সম্পর্কে ঋতা বসু তাঁর 'শ্রীসদনের শ্রীমতীরা' গ্রন্থের 'শ্রীসদনের জন্মবৃত্তান্ত' অংশে লিখছেন, ''শ্রীমতীদের লীলাক্ষেত্র শ্রীসদনের জন্ম ইতিহাসটি কিন্তু মোটেই সহজ নয়। অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে লড়াই করে সে

© Santiniketan Sahityapath

আজকের এই জায়গায় এসে পৌছেছে... শান্তিনিকেতনের মেয়ে বোর্ডিং একটা সামাজিক বিপ্লবই বটে। আমরা এক সময়ে নিজেদের অজান্তেই এর অঙ্গ ছিলাম, তখন মনে হলো এই অসাধারণ সৌভাগ্যের খবরটি সবাইকে না জানালেই নয়।"[১৬]

সূচনাকাল থেকে থেকে বিশ্বভারতীতে মুলত ছেলেদের পড়াশোনার ব্যবস্থা ছিল। ১৯০৮ সালের আগে পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের স্কুলে শুধুমাত্র ছেলেরাই লেখাপড়া করত। অথচ সেই সময় আশ্রমে পড়ুয়া মেয়েদের অভাব ছিল না। রবীন্দ্রনাথের নিজেরই দুই মেয়ে মাধুরীলতা ও মীরাও ছিল এই দলে। একটি বালিকা বিদ্যালয়ের চারা আপনিই গজিয়ে উঠেছে এবং হু হু করে সেটি বেড়ে ওঠার মতলব করছে। অনেকদিন থেকে ১৯০৮ সালের পরে কোনোরকম আড়ম্বর সভাসমিতি প্রস্তাবনা ছাড়াই ভেতরের প্রয়োজন থেকেই মেয়েরা স্কুলের অঙ্গ হয়ে উঠল। ১৯০৯ সালে রবীন্দ্রনাথ স্কুলের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখছেন, "বিদ্যালয়টি বেশ পুর্ণ হয়ে এসেছে। ক্রমে ক্রমে তার পাশে মনে ইচ্ছে ছিল। ভয়ে এগোয়নি। ঠাকুর যখন আপনিই ঘরে এসেছেন, পূজা না করে আর নিষ্কৃতি নেই। পরিচিতি বা আত্মীয়তার সূত্রে যে মেয়েরা পড়তে এল তাদের থাকবার জন্য বোর্ডিং এর ব্যবস্থা করা হলো। বোর্ডিং-এর দেখাশোনা করার জন্য এলেন মোহিতচন্দ্র সেনের বিধবা স্ত্রী সুশীলদেবী। তিনি শান্তিনিকেতনের মেয়ে বোর্ডিং এর প্রথম সুপার। তখন শান্তিনিকেতন মেয়েদের জন্য খুব খোলামেলা ছিল না। মেয়েরা মোটামুটি আড়ালেই থাকত, ঋতা বসু লিখছেন — "অদ্ভুত মনে হলেও পড়াশুনার সময়টা বাদ দিয়ে তখনকার আশ্রমে রীতিমতো পরদাপ্রথা চালু ছিল। একবার মেয়েরা লক্ষ্মীর পরীক্ষা নাটকটা করেছিল। সেই নাটকের পুরুষ দর্শকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও আগাগোড়া ছিলেন পরদার আড়ালে ভাবা যায়? মেয়েরা ইচ্ছামতো ঘোরাঘুরি করতে পারত না। পৌষ উৎসবের মাঠ যেখানে এখন স্কুলের বাচ্চা মেয়েরাও ছাড়া গরু, সেই মাঠেই মেয়েদের স্বাধীনতা ছিল না। একটা প্রকাণ্ড কাঠের গাড়িতে তাদের বসিয়ে বড় ছেলেরা আর মাস্টারমশাইরা মিলে সেটাকে টেনে নিয়ে যেত মেলার মাঠে। বেচারা মেয়েরা গাড়িতে বসেই বাজি পোড়ানো দেখত।"[১৭] এহেন শান্তিনিকেতনে মেয়েরা বোর্ডিং-এ থেকে ছেলেদের পাশে বসে একসঙ্গে পড়াশোনা করবে সেটা আজ যত সহজে ভাবা যাচ্ছে একশো বছর আগের সমাজে সেটা ছিল না। মেয়েরা বাড়িতে বসে একটু আধটু অক্ষর চিনলেই যেখানে যথেষ্ট ভাবা হতো, সেখানে সহশিক্ষার কথা তো কল্পনাও করা যায় না, হলেই বা রবীন্দ্রনাথের স্কুল। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের স্কুল খোলার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সাত বছর কোনো উদ্যোগ নেন নি, কেন নেন নি তা তাঁর 'ভয়ে এগোয়নি' কথাটার মধ্যে নিহিত। মেয়েদের স্কুল চালু হবার কিছুদিনের মধ্যে রক্ষণশীল সমাজের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল ভয়াবহ আকারে, "শান্তিনিকেতন নিয়ে বঙ্গ সমাজে তোলপাড়, চারদিকেই গেল গেল রব... মোটকথা মেয়েদের উপস্থিতিতে আশ্রমের পবিত্র বাতাস বিষিয়ে উঠছে, এটাই ঘরে-বাইরে প্রধান অভিযোগ হয়ে দাঁড়াল। এই তালিবানি মনোভাবের জন্য আশ্রম অশান্ত হয়ে উঠল। আশ্রমের এক ছাত্র সরোজ চক্রবর্তীর আত্মহত্যার পিছনে হস্টেলের একটি মেয়ের ভূমিকা আছে বলে গুজব উঠল। রবীন্দ্রনাথ এবং হস্টেল সুপার সুশীলাদেবীকে আসামী বানিয়ে সমাজ কাঠগোড়ায় দাঁড় করাল। ট্রাস্টিরা খরচের কথা তুলে সহশিক্ষার বিরুদ্ধে আপত্তি তুললেন। সুশীলাদেবী কাজ ছেড়ে দিলেন। এরপর রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমারের মা গিরিবালাদেবী মেয়ে বোর্ডিং-এর ভার নিলেন। কিন্তু তিনিও কিছুদিন পর আর এলেন না। ১৯১০ সালে মেয়ে বোর্ডিং বন্ধ হয়ে গেল। স্কুলটিও বন্ধ হলো। অত্যন্ত দুঃখ ও অনিচ্ছা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাধ্য হলেন পিছু হটতে। তিনি অজিত চক্রবর্তীকে লিখলেন মেয়েদের স্কুল উঠে গিয়েছে কিন্তু তার বেদনা তাঁর মন থেকে কিছুতেই যাচ্ছে না। তিনি মনে করছেন, সেই বিদ্যালয়টিকে কোনো ও অনুকূল জায়গায় গড়ে তুলবার চেষ্টা করতে হবে, দেশে যার প্রয়োজন আছে তাকে সহজে ত্যাগ করা চলে না। মেয়েদের পড়াশোনার থেকেও পরিবারের বাইরে থাকা নিয়ে সমস্যা ছিল বেশি। পরিবারের পুরুষ সদস্যদের প্রত্যক্ষ নজরদারির বাইরে থাকাটা সমাজের কাছে স্বস্তিজনক ছিল না। লেখিকা স্পষ্টতই লিখছেন — "স্কুলের থেকেও সমাজের বেশি আপত্তি ছিল মেয়েদের বোর্ডিং এ থাকা নিয়ে। ১৯০৮ সালের রক্ষণশীলতাকে স্ত্রীশিক্ষা যতটা নাড়া দিয়েছিল তার থেকে অনেক বেশি করেছিল মেয়ে-বোর্ডি।"[১৮] তারপর রবীন্দ্রনাথ নোবেল পাবার পর বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হবার পর ১৯২২ সালে দ্বিতীয়বার বোর্ডিং স্কুলের যাত্রা শুরু হলো। দ্বারিক বাড়ির পাশে লেবুকুঞ্জে তখনকার মতো মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা হলো। বোর্ডিং-এর ভার নিলেন স্নেহলতা দেবী। রবীন্দ্রনাথ খুশি হলেন। সমাজের প্রয়োজন ছিল বলেই মেয়েরা আস্তে আস্তে দলে ভারী হতে লাগল, "মেয়েদের জন্য এবার একটি বড় বাড়ি না হলেই নয়। ১৯২৮ সালে তৈরী হলো শ্রীভবন। সেটাই আজকের শ্রীসদন।"[১৯]

© Santiniketan Sahityapath

আবাসিকাদের 'ভগ্নিত্ববোধ'এ রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শনের প্রতিফলন:

শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে মেয়েদের শিক্ষার এবং ছাত্রীনিবাস নির্মাণের ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ। ১৯১০ সালে প্রবল বিরোধিতায় যা উঠে গিয়েছিল তা দশ-পনেরো বছরের মধ্যেই তা শুরু হলো। মেয়েরা হস্টেলে থাকল এবং ছেলেদের পাশে বসে পড়াশোনা করার সঙ্গে সঙ্গে আঁকা নাচ গান নাটক সব কিছুতেই অংশ নিল। শান্তিনিকেতনের জীবনে সেই সময় যতগুলি বড়ো পরিবর্তন ঘটেছে শ্রীসদন তার মধ্যে অন্যতম। সমাজের নানা বিরোধিতা কমে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ নোবেল পাবার পর। সারা বিশ্বে নাম ছড়িয়ে পড়ার পর পুরনো বাধাগুলি আর ধোপে টিকলো না। ভারতবর্ষের নানা জায়গা থেকে মেয়েরা পড়তে এলো এখানে। ঋতা বসু জানাচ্ছেন নারী নরকের দ্বার, মাত্র পনেরো বছর আগের এই মানসিকতার আমূল পরিবর্তন ঘটাল শান্তিনিকেতনের মেয়ে হস্টেল-শ্রীসদন। আদর্শগত পার্থক্যের কারণে বিশ্বভারতীর সঙ্গে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসজীবনের সঙ্গে এখানকার আবাসজীবনের কিছু মৌলিক পার্থক্য ঘটেছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে হস্টেল ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার সুত্রে শুধুমাত্র থাকার জায়গা হিসাবে এসেছে। দূরের কিছু ছাত্রছাত্রীর হস্টেলে থাকার ব্যবস্থা হয় হস্টেলে। অন্যদিকে বিশ্বভারতীতে আবাসজীবন এসেছে একটি জীবনচর্যার অঙ্গ হিসাবে। আশ্রম শিক্ষালাভের সঙ্গে সেখানে বসবাসের একটি অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে। সেখানে শিক্ষা শুধুমাত্র দশটা থেকে পাঁচটার কয়েকটি ক্লাশ ও শ্রেণিকক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সেখানে শিক্ষা একটি বিশেষ জীবনচর্যা যা দিনের সবটুকু সময়ের উপস্থিতি দাবী করে। তবে বেশকিছু ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যেমন জে এন ইউ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি যেগুলি শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠলেও এর ক্যাম্পাসগুলি ধীরে ধীরে একটি নিজস্ব সংস্কৃতি বোধ গড়ে তুলেছে যা ছাত্রছাত্রীদের প্রভাবিত করে। কিন্তু বিশ্বভারতীর ক্ষেত্রে বিষয়টা ভিন্নতর কারণ প্রচলিত শিক্ষাব্যাবস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় তপোবন শিক্ষাব্যবস্থার মতো আশ্রম শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যই এই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলেছিলেন। এই বিশেষ আদর্শ ও উদ্দেশ্যমূলকতা এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে এবং এর অন্তর্গত আবাসজীবনকে বাকী বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসজীবন থেকে আলাদা করেছে। ভারতীয় প্রাচীন আশ্রম শিক্ষাব্যবস্থার মতো শান্তিনিকেতনে তৈরি হয়েছে আবাসজীবন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়টি সূচনাপর্ব থেকেই আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যা তিনি আশ্রম সম্মিলনীর নিয়মাবলীতে উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্র আদর্শকে প্রচলিত করার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়টিই নয়, রবীন্দ্রনাথের আশ্রম শিক্ষাকে বলবত ও সঞ্চারিত করার ক্ষেত্রে হস্টেলগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য। ছাত্রছাত্রীদের কাছে আশ্রম শিক্ষাকে দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হিসাবে আরো নিবিড় করে তুলেছে হস্টেলগুলি এবং সেইসূত্রে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকার থেকে স্বাতন্ত্র্য স্থাপিত হয়েছে এই আবাসিক এলাকার।

আমার এম ফিল গবেষণা মেয়েদের হস্টেল জীবনের অভিজ্ঞতা বিষয়ে, বিশ্বভারতীর শ্রীসদন, প্রতিমা, আনন্দসদন, মৃণালিনী, বিড়লা, গোয়েঙ্কা হস্টেলের আবাসিকাদের সাক্ষাতকার গৃহীত হয়েছে এবং আমার পিএইচ ডি গবেষণা বিশ্বভারতী ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার অভিজ্ঞতা এবং হস্টেল জীবন বিষয়ে। এক্ষেত্রেও অর্ধেক অংশগ্রহনকারীরা বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। এই দুই পাঠ থেকে ছাত্রীদের যে মনোভাব, অভিজ্ঞতা উঠে আসে তাতে খুব স্পষ্ট যে হস্টেল তাদের জীবনে এক বিরাট ভূমিকা নিয়েছে। বাড়িতে সমবয়সীদের সঙ্গে বেড়ে ওঠার চেয়ে হস্টেলে সমবয়সীদের সঙ্গে দীর্ঘ একত্রবাস তাদের দিয়েছে বহির্জীবনের আনন্দ। যেখানে মেয়েদের গতিশীলতা খুব সীমিত সেখানে হস্টেল তাদের কাছে স্বাধীনতার স্বাদ এনে দিয়েছে। হস্টেল হয়ে ওঠে একান্ত ব্যক্তিগত পরিসর যেখানে নিজের জীবন হাতের মুঠোয় এসে ধরা দেয়। পরিবার, বিবাহ, বৈবাহিক এবং রক্তসম্পর্কিত ক্ষমতা বিন্যাস যেভাবে একজন ব্যক্তিকে ক্ষুদ্র আমির ভিতর গড়ে তোলে, শান্তিনিকেতনে আবাসজীবন জীবন ও জগত সম্বন্ধে ভিন্ন এক প্রতীতি দেয়, সামনের পৃথিবী অন্য ভাবে ধরা দেয়। সেখানে আপন হতে বাহির হয়ে মানুষ বাইরে দাঁড়ায়। সেখানে পরিবার অনেক বৃহৎ, স্বজনের সংজ্ঞা আলাদা, মানবিকতা, ক্ষমা, আনন্দ, সংবেদনশীলতা, দিয়ে গড়া এক ভিন্ন স্বজনের বৃত্ত।

আবাসজীবনের বিকল্প পরিসরে আবাসিকাদের ভিতর তৈরি হয়ে ওঠে 'নবনির্মিত আত্ম'। নারী যেখানে নিজের সমানাধিকারের জন্য পরিবারে বাইরে সর্বত্র লাঞ্ছিত সেখানে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন নারীকে দেখাল এক ভিন্ন বাস্তবতা। যেখানে একজন ছাত্রী পরিবারের নানাবিধ ভূমিকার বাইরে নিজেকে নতুন ভূমিকায় দেখল, ছাত্রী, সহপাঠী, আবাসিক, বন্ধু ইত্যাদি। ছাত্রীরা জানাচ্ছেন কীভাবে তাঁরা

পরিবারের বাইরে এসে হস্টেলে দিদিদের সহায়তা পেয়েছেন, কীভাবে সাহচর্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন হস্টেলের দিদিরা, জীবনে নানা সমস্যায়, লেখাপড়ায় তাঁরা অভিভাবক পেয়েছেন। দুঃস্থ পরিবারের মেয়েটি দিদিদের কাছ থেকে পেয়েছেন তথ্য, গাইডেন্স। তাঁরা একে অন্যের শাড়ি, গহনা ভাগ করে পড়েছেন, ভাগ করে খেয়েছেন খাবার। সময়ে অসময়ে পাশে থেকেছেন, অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে বন্ধু আর দিদিদের পেয়েছেন পাশে। এই পরম্পরা দীর্ঘসময় ধরে চলে আসছে। যে সম্পর্কের রেশ তাঁরা হস্টেল ছেড়ে চলে যাবার পরও থেকে গেছে। এইভাবে দিদি, ভগিনী, সই, সখীরা নিজেদের ভিতর আরো একটি সত্তার উদ্বোধন হতে দেখেছেন যা ক্ষুদ্রত্ব থেকে অনেক উচ্চ, যা অনেক উদার, প্রসারিত। শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের ছাত্রীদের স্মৃতিকথা রানীচন্দের 'সব হতে আপন', রমা চক্রবর্তীর 'ভরা থাক স্মৃতিসুধায়' থেকে ধারাবাহিক ভাবে এই একবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ও রচিত হয়েছে অহনা বিশ্বাসের 'মেয়েদের হস্টেল: অন্দরের কথামালা', ঋতা বসুর 'শ্রীসদনের শ্রীমতীরা' যেখানে শান্তিনিকেতনের প্রথম মেয়েদের হস্টেল শ্রীসদন আজও আবাসিকাদের কাছে বিকল্প পরিসর হিসাবে প্রতিভাত।

তথ্যসূত্র:

১। 'চিঠিপত্র' ১৩ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৭৯
২। 'চিঠিপত্র' ১১ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা (১৩৮১, পুনর্মুদ্রণ ১৪১৭), পৃ. ৮২
৩। 'শ্রীসদনের ইতিকথা', বাণী নিয়োগী, রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন, ২০০১, পৃ. ৬৭
৪। 'বিশ্বভারতী নিউজ', ডিসেম্বর সংখ্যা, শান্তিনিকেতন, ১৯৩২
৫। 'শ্রীসদনের ইতিকথা', বাণী নিয়োগী, রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন, ২০০১, পৃ. ১২১
৬। 'আমাদের গুরুদেব', সাধনা কর, প্রবাসী প্রেস, কলকাতা, ১৩৪৮, শ্রাবণ, পৃ. ৭১০
৭। 'শ্রীসদনের অধ্যক্ষা হেমবালা সেন' শ্রেয়সী, নব পর্যায়, আলাপিনী মহিলা সমিতি, শান্তিনিকেতন, ৭ পৌষ, ১৩৯৮, পৃ. ১৪
৮। ওই, পৃ. ৮
৯। ওই, পৃ. ৮
১০। 'সব হতে আপন', রানী চন্দ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, শান্তিনিকেতন, ১৪০১, পৃ. ৫৫
১১। 'শান্তিনিকেতনে আশ্রমকন্যা', অমিতা সেন, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ৯৫-৯৬
১২। 'শান্তিনিকেতন' বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৩২, পৃ. ২২৪
১৩। 'বিশ্বভারতী নিউজ', জুলাই সংখ্যা, শান্তিনিকেতন, ১৯৩৪, পৃ. ৯০
১৪। শ্রীভবন সম্বন্ধে আমার আদর্শ —
১৫। শান্তিনিকেতন পত্রিকা, মাঘ সংখ্যা, শান্তিনিকেতন, ১৩২৯, পৃ. ৯৯
১৬। 'শ্রীসদনের শ্রীমতীরা', ঋতা বসু, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৫২
১৭। ওই, পৃ. ৫৩
১৮। ওই, পৃ. ৫৫
১৯। ওই, পৃ. ৫৫

গ্রন্থপঞ্জি:

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চিঠিপত্র', ১৩ খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৯২
২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চিঠিপত্র', ১১ খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, (১৩৮১, পুনর্মুদ্রণ ১৪১৭)
৩। বাণী নিয়োগী, 'শ্রীসদনের ইতিকথা', রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন, ২০০১
৪। 'বিশ্বভারতী নিউজ', ডিসেম্বর সংখ্যা, শান্তিনিকেতন, ১৯৩২
৫। সাধনা কর, 'আমাদের গুরুদেব', প্রবাসী প্রেস, কলকাতা, ১৩৪৮, শ্রাবণ
৬। 'শ্রীসদনের অধ্যক্ষা হেমবালা সেন', শ্রেয়সী, নব পর্যায়, আলাপিনী মহিলা সমিতি, শান্তিনিকেতন, ৭ পৌষ,১৩৯৮
৭। রানী চন্দ, 'সব হতে আপন', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, শান্তিনিকেতন, ১৪০১
৮। অমিতা সেন,'শান্তিনিকেতনে আশ্রমকন্যা', টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা, ১৯৭৭
৯। অহনা বিশ্বাস, 'মেয়েদের হস্টেল-জীবন অন্দরের কথামালা', গাঙচিল, কলকাতা, ২০০৯

© Santiniketan Sahityapath

১০। অহনা বিশ্বাস, 'অহনা বিচিত্রা, আরশি নগরে তাঁবু', প্রথম সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০০
১১। সাধনা কর, 'আমাদের গুরুদেব', প্রবাসী প্রেস, কলকাতা, শ্রাবণ ১৩৪৮
১২। ঋতা বসু, 'শ্রীসদনের শ্রীমতীরা', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৬
১৩। 'বিশ্বভারতী নিউজ', জুলাই সংখ্যা, শান্তিনিকেতন, ১৯৩৪
১৪। শ্রীভবন সম্বন্ধে আমার আদর্শ —
১৫। শান্তিনিকেতন পত্রিকা, মাঘ সংখ্যা, শান্তিনিকেতন, ১৩২৯
১৬। মধুপর্ণা কর্মকার, 'গার্লস হস্টেল; আবাসিক নারীর মানসভূমি', একলব্য, কলকাতা, ২০১৮
১৭। E. Goffman, 'Asylums: Essays on the Situations of Mental Patients and Other Inmates', 1961
১৮। T. Mukhopadhyay, & A. Sen, 'Sharing the Dream–The Remarkable Women of Santiniketan', Rabindra Bhavana, Santiniketan, 2016
১৯। S. Scott, 'Total Institutions and Re-Inventive Identities', Palgrave Macmillan, 2011
২০। A. Shreeya, 'The Self as an Active Agent: Understanding Goffman's Theory of Resistance in Total Institutions through Life histories', Sage, 2018

—

Prantik Gabeshana Patrika